কালের কণ্ঠ

আপডেট : ৫ আগস্ট, ২০২২ ২২:১৫

জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতি ও কর্মমুখী শিক্ষা

ড. মো. নাছিম আখতার

তরুণ বয়সে পার্শ্ববর্তী দেশের অত্যন্ত মেধাবী একজন মানুষের সঙ্গে আমার পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি আমাদের দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সমমানের পরীক্ষায় দেশসেরা ছিলেন। তিনি ছিলেন আমার দেখা সফল মানুষগুলোর অন্যতম। একটি কাজের অজুহাতে আমি প্রায় ১৫ ঘণ্টা তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছিলাম। নিজেদের মধ্যে কথোপকথনের এক পর্যায়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘কেন প্রতি ক্লাসে ভালো রেজাল্ট করাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়? কিন্তু আমরা তো পরবর্তী সময়ে ওই ক্লাসে যা পড়েছিলাম তার বেশির ভাগই ভুলে যাই।’

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ‘রেজাল্ট ওই বয়সে একজন শিক্ষার্থীর ওপর অর্পিত প্রাতিষ্ঠানিক শিখনসংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে সচেতনতার নির্ণায়ক। অনুরূপভাবে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি ধাপেই শিক্ষার্থীর প্রাতিষ্ঠানিক রেজাল্ট তার একাগ্রতা ও নিষ্ঠার বহিঃপ্রকাশ। এই রেজাল্ট দেখেই নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অনুমান করে যে পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিগত কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব ওই শিক্ষার্থীকে দিলে সে কতটা নিষ্ঠা, সততা ও একাগ্রতার সঙ্গে পালন করবে।’ সুতরাং কোনো শ্রেণির রেজাল্টকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। তরুণ

প্রজন্মের অনেকেই ইউটিউব, ফেসবুক, গুগল ইত্যাদি দেখে ধারণা করে আমেরিকায় পড়াশোনা না করেও বড় উদ্যোক্তা হওয়া যায়। আমার মতে, এটি কিশোর বয়সে পড়াশোনার ঝামেলাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার একটি খোঁড়া যুক্তি মাত্র। যদি পড়াশোনায় ভালো ফলাফল দরকার না-ই থাকত, তাহলে বিদেশে শিক্ষাবৃত্তি বা ইমিগ্রেশনে ডিগ্রি বা রেজাল্টের জন্য নম্বর বরাদ্দ থাকত না।

একবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতির বিকাশ বাংলাদেশকে স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধ করবে। কিন্তু বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা কি সেই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হিসেবে কাজ করছে? সম্প্রতি একটি দৈনিকের খবরের শিরোনাম "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খ' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় পাসের হার মাত্র ৮.৯ শতাংশ।" খবরটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছেন তাঁরা ভালো ছাত্র হিসেবে পরিচিত। তাঁদের ভর্তি পরীক্ষার বিষয়বস্তুও ছিল উচ্চ মাধ্যমিকে পঠিত সিলেবাসের জ্ঞান। তাহলে কেন এত শিক্ষার্থী পাস নম্বর পায়নি?

শিখনদক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় গলদ রয়েছে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে গণিত বা বিজ্ঞানের বইয়ের কলেবর যদি ৪০০ পৃষ্ঠার হয়, তাহলে সেখানে গাইড বইয়ের কলেবর এক হাজার পৃষ্ঠার। এমন একটি অবস্থা যে গাইড বই ছাড়া শুধু পাঠ্য বই পড়ে পরীক্ষার প্রশ্নের ধাঁচ বা ধারা বোঝা অসম্ভব। এমন অবস্থায় শিক্ষার্থীরা হতাশা থেকে হতোদ্যম হয়ে পড়ে। এর ফলে জ্ঞানের নিখুঁততম বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। এখন শিক্ষার্থীদের বই পড়তে বললে বলে, বই থেকে তো প্রশ্ন হয় না। ফলে গাইডকেই তারা মূল বই আর মূল বই তাদের কাছে সহায়ক বই হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ক্ষেত্রবিশেষে এটাও সত্য যে অনেক শিক্ষকও গাইড বইয়ের সহায়তা ছাড়া প্রশ্ন করতে পারেন না। আরেকটি বিষয় গভীরভাবে লক্ষ করলাম, আমার বড় ছেলে যখন ২০১৮ সালে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে, তখন নির্দিষ্ট বিষয়ের গাইড বইয়ের কলেবর ছিল ৭৫০ পৃষ্ঠা। ২০২২ সালে মেয়ে যখন নবম শ্রেণিতে ভর্তি হলো, তখন ওই একই প্রকাশনার গাইড বইয়ের আকার হয়েছে এক হাজার পৃষ্ঠা। সৃজনশীলের চক্করে গাইড বইয়ের কলেবরের নিরন্তর বৃদ্ধিতে শিক্ষার্থীরা দিশাহারা।

আমার ২৩ বছরের শিক্ষকতা জীবনে পরীক্ষার প্রত্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালনের সময় একটি বিষয় গভীরভাবে লক্ষ করেছি, তা হলো কিছু শিক্ষার্থী পরীক্ষা চলাকালে কলম দিয়ে দাঁতে মৃদুভাবে ঠোকা দিয়ে পড়া মনে করার চেষ্টা করে। আবার কেউ কেউ ছাদের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে পড়া আউড়িয়ে পড়া মনে করার চেষ্টা করে। আমার অভিজ্ঞতা বলে, উভয় শিক্ষার্থী বিষয়গুলো হয়তো পড়েছে কিন্তু লেখার মাধ্যমে অনুশীলন করে নিজের মধ্যে প্রত্যয় ও দৃঢ়তা তৈরি করেনি। তাই পরীক্ষার মতো মানসিক চাপের সময় প্রশ্নের উত্তরগুলো মনে পড়ছে না। তাই তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তরপত্রে সঠিক উত্তর লিখতে অপারগ হচ্ছে। আমার অভিজ্ঞতা বলে, লেখার মাধ্যমে পড়া পরিপূর্ণতা পায়। লেখা হলো শিখন জ্ঞানটি নিজের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে গ্রথিত হয়েছে কি না তা যাচাইয়ের উত্কৃষ্ট পন্থা। জ্ঞানটি পরিপূর্ণরূপে শিক্ষার্থীর ভেতর প্রবেশ করলেই কেবল সেটি সঠিকভাবে লেখার মাধ্যমে তারা তুলে ধরতে পারে। সঠিকতা বিষয়টি হলো মনের গহিনের সত্তাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা। এই চেষ্টাই মানুষকে সঠিক পথে জ্ঞানার্জন ও প্রজ্ঞাবান হতে সহায়তা করে। আমরা প্রায়ই বলি, মুখস্থ করার দরকার নেই। কিন্তু গণিত, পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের সূত্রগুলো মনে না রেখে বা মুখস্থ না করে এমন কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি কি আছেন, যাঁরা আমাকে এ বিষয়সংক্রান্ত কোনো অঙ্ক করে দিতে পারবেন। সুতরাং মুখস্থ একটা পর্যায়ে করতেই হবে, এর বিকল্প নেই। আর অঙ্কের ক্ষেত্রে

চর্চাই একমাত্র পন্থা। চর্চা না করলে কোনো পরীক্ষায় সেই অঙ্ক করে আসা প্রায় অসম্ভব। কারণ সেখানে থাকে সময়ের সীমাবদ্ধতা ও পরীক্ষাজনিত উৎকণ্ঠা।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তব অবস্থা হলো ১০টি পাঠ্য বইয়ের কলেবর যদি মোটামুটি চার হাজার পৃষ্ঠার হয়, তাহলে তার সহায়ক গাইডের কলেবর ১০ হাজার পৃষ্ঠা। একজন শিক্ষার্থীর পঠন দায়িত্বের মধ্যে শুধু পাঠ্য বইয়ের চার হাজার পৃষ্ঠা গণনা করলে মাধ্যমিক পর্যায়ে দুই বছরে তাকে প্রতিদিন পাঁচ পৃষ্ঠা পড়তে হয়। বাকি সময় সে অনুশীলনে ব্যয় করতে পারে। কিন্তু গাইড বইসহ গণনা করলে শিক্ষার্থীর ওপর পঠন দায়িত্বের পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪ হাজার। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে প্রতিদিন ১৯ পৃষ্ঠা করে পড়তে হবে। এমন অসীম দায়িত্বের বেড়াজালে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যে অনুশীলন সেটা প্রায় অসম্ভব।

পাঠ্য বইয়ের সমস্যাগুলোই সমাধান ও অনুশীলনের সুযোগ দিয়ে ওগুলোর ওপর জ্ঞান যাচাই করলে ওই শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর ওপর অর্পিত দায়িত্বের প্রতি নিষ্ঠা ও একাগ্রতা যাচাই করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে তারা তাদের ওপর অর্পিত শিখন দায়িত্বের নির্দিষ্ট একটা সীমারেখা পাবে। তাদের শিখন দক্ষতা বাড়বে। সৃষ্টি হবে প্রত্যয়ী নবপ্রজন্ম। এভাবেই জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় এগিয়ে যাবে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি।

লেখক : উপাচার্য, চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

Print

সম্পাদক : শাহেদ মুহাম্মদ আলী,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্রধান কার্যালয় : প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ ও সুপ্রভাত মিডিয়া লিমিটেড ৪ সিডিএ বাণিজ্যিক এলাকা, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০ ও কালিবালা দ্বিতীয় বাইপাস রোড, বগুড়া থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯।
পিএবিএক্স : ০৯৬১২১২০০০০, ৮৪৩২৩৭২-৭৫, বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৮৪৩২৩৬৮-৬৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮৪৩২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮৪৩২০৪৭, সার্কুলেশন : ৮৪৩২৩৭৬। E-mail : info@kalerkantho.com